Website: https://www.parthasarathipatrika.com

৩২ তম অন্তর্জাল সংখ্যা

৭ই অগ্রহায়ণ, ১৪২৯ / 24.11.2022

- সম্পাদক -

সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

-: সূচীপত্র :-

সংসার ও যোগ	শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
জপ ও মন্ত্র	সঙ্কলিত
তন্ত্রের মূল-তত্ত্ব	শ্রী নলিনীকান্ত গুপ্ত
শ্রীঅরবিন্দের সাধনা	শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
পরম বৈষ্ণব শ্রীজীব গোস্বামী	শ্রী অমরেন্দ্র কুমার ঘোষ
ক্রান্তিবৃত্তে	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-magazine by Publisher: Sunandan Ghosh during prolonged Nationwide Lockdown in 2020.

Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720

DO NOT COPY

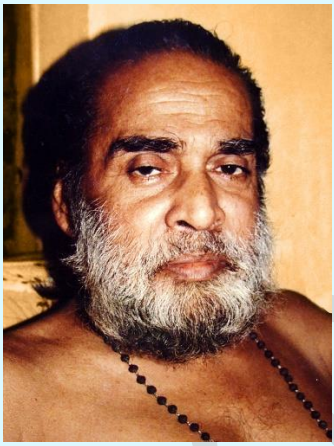

(১০.০৩.১৯২৬ - ২৪.১১.১৯৮৬)

সংসার ও যোগ

শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ

চক্ষু বুজিয়া ধ্যান বা সমাধি না করিলেও 'যোগ' হইয়া থাকে, যেমন তুমি যদি সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি আদি সমস্ত ভগবদর্থে কাজে নিযুক্ত রাখিতে পার তাহা হইলেও তোমার 'যোগ' সহজ ভাবেই হইবে। তুমি অভিমানশূন্য হও, নিরহঙ্কার হও। যে কাজ করিতেছ তাহা নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে কর। তুমি ঈশ্বরের 'সেবা' করিতেছ, ইহা তাঁহারই কাজ, এ সংসার তাঁহারই, এই ভাব সর্বদা মনে জাগাইয়া রাখিতে হয়। সংসারে যেমন পিতামাতার নির্দেশে আমরা সকল কর্ম শ্রদ্ধা ও প্রেমের সঙ্গে করি, যেমন কল কারখানা, অফিস কাছারিতে উপরওয়ালার নির্দেশে কর্তব্যকর্ম যথাযথ করিয়া থাকি, তেমনই এ সংসারে যাহা কিছু কর্ম আছে, সে সবই ঈশ্বরেরই কর্ম মনে করিয়া করিতে হয়।

কর্ম নিষ্কামভাবে করিতে হইবে। সমস্ত কর্মই কর্তব্যকর্ম মনে করিয়া করিতে হইবে। কর্মে ছোট বড় নাই। কর্মের কেন্দ্রকে ঠিকভাবে রাখিয়া, শ্রদ্ধা প্রেম ভালবাসার দ্বারা কর্মের উদ্দেশ্য ও সফলতার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে।

সংসারে সকলেরই সন্তান থাকে না। যখন আমার আছে এবং ঈশ্বর যখন বিশ্বাস করিয়া তাহাদের আমার নিকট পাঠাইয়াছেন, তখন তাঁহাদের ঈশ্বর

DO NOT COPY

জ্ঞানে সেবা করিতে হইবে। তুমি যত বেশী তোমার স্ত্রী পুত্রদের আনন্দে রাখিতে পারিবে, তত বেশী ঈশ্বর খুশি হইবেন, কারণ তাহাদের ভিতর দিয়া সংসারের যে রস ও মাধুর্য্য তাহা আস্বাদন করিতেছেন। যেমন, তুমি বাজার করিতেছ, কাহার জন্য করিতেছ? ঈশ্বরের জন্য করিতেছ। রান্না করিতেছ, তাহাও ঈশ্বরের জন্য করিতেছ। তুমি বিছানা যখন করিবে, মনে রাখিবে সে বিছানায় তোমার সঙ্গে তোমার ঈশ্বরও বিশ্রাম করিবেন। সর্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সৌন্দর্য্য ভাব লইয়া থাকিতে হয়। কারণ ঈশ্বর সর্বদাই আমাদের সঙ্গেই আছেন। বাজার বলো রান্না বলো কোন জিনিষই তুমি খারাপ ভাবে করিতে পারিবে না কারণ তোমার ছেলে মেয়ে গ্রহণ করিবে। যেমন ভগবানের জন্য পূজার উপকরণ আমরা শুদ্ধ ও পবিত্র রাখি, তেমনই এ সংসার ও স্ত্রী পুত্র যাহা কিছু আমরা সংসার বলিতে বুঝি, সবই ঈশ্বরময়। সর্বদা মনে রাখিবে, তোমার স্ত্রী পুত্র যদি সংসারে আনন্দে ও সুখে থাকে তবে ঈশ্বরও সুখ ও আনন্দ লাভ করেন। ঈশ্বর লীলাময়, তিনি জগৎ সংসারে লীলা করিতেছেন। আর আমরা তাঁর এই লীলার সহায়তা করিবার জন্য আসিয়াছি ।তাই সর্বদা নিজেকে খুলিয়া রাখিতে হয় ঈশ্বরের দিকে, যাতে তিনিও আমাদের তাঁর কাজের মত করিয়া গড়িয়া নিতে পারেন।

স্মৃতিচারণ **শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ**

শীতকাল এলেই প্রাণটা ছটফট করে ওঠে। কত আনন্দে আমাদের দিনগুলি কাটতো! শ্রী প্রীতিকুমারের সঙ্গে পিকনিকে যাওয়া, দল বেঁধে বেড়াতে যাওয়া। সব শেষ! ১৯৮৬-র নভেম্বর থেকে আমরা দলছুট হয়ে গেছি। সেই দিনগুলি আর সোনার খাঁচায় রইল না।

অবশ্য এই আনন্দের দিনগুলি এসেছিল ১৯৬৪-৬৫ সালে। তার আগে পর্যন্ত ছিল সংগ্রামের দিন। শ্রীপ্রীতিকুমার বাল্যকালে পিতৃহারা হন। সংসারের পূর্ণ দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। সেসব আমার শোনা কথা। আমি আমার দাদার বিয়ের সময় যখন তাঁকে দেখেছি- তিনি রাশভারী, গম্ভীর। এক মুখ দাড়ি। তীব্র দৃষ্টি। বেশীর ভাগ লুঙ্গি পরেই আসতেন। মাঝে মাঝে মৌন থাকতেন, তাই

কথা আর বলা হয়নি। তাঁকে চিনতে আরম্ভ করলাম ১৯৫৩ সালে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার পর থেকে। ১৯৫৫ সাল থেকে আমাদের বাড়িতে আসতেন। তখনকার সাজ দেখবার মতো। ধুতি পাঞ্জাবী ধোপদুরস্ত। পায়ে এক এক দিন এক এক রকম জুতো। বীরের মতো সোজা হেঁটে আসতেন। অনেক বাড়ির জানলা খুলে যেতো । আমি তাঁকে ঠিক assess করতে পারতাম না তখন। এখনও পারিনা। আমার প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল। স্নেহ ছিল। আমার বাবা তাঁর প্রতি সহজে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তখনকার দিনে মোটামুটি পাত্রের নিজস্ব কি আছে, কত সম্পত্তি, এসব পরিমাপ করা হতো না। পরিবার সংস্কৃতি শিক্ষা দেখে নিয়ে পাত্রস্থ করা হতো। আমাদের নিকট আত্মীয় দেখে বাবা আর জিজ্ঞেস করেন নি তাঁর Source of income কি ছিল, কত আয় ইত্যাদি। জানতেন business আছে। স্বচ্ছলতা আছে। বাবা একটি কথাই বলেছিলেন – আমাকে বিএ পর্যন্ত তিনি পড়াবেন। তাই আমাদের ঐটুকু বয়সে অর্থনৈতিক দিকটা ভাববার প্রয়োজন হয়নি কখনও। বিয়ের পর পড়াশুনার জন্য শ্বশুর বাড়ীতে বেশী থাকা হয়নি। সুদূর মেদিনীপুরের পশং গ্রাম থেকে বেথুন কলেজে ক্লাস করা সম্ভব ছিল না। তাই আমি দমদমে বাপের বাড়ীতে থাকতাম, ছুটিতে পশং যেতাম। শ্রীপ্রীতিকুমার তখন শনিবার শনিবার পশং যেতেন। থলি ভর্তি খাবার সব্জী ইত্যাদি যা যা ভাল লাগে বয়ে নিয়ে যেতেন সবাইকে খুশী করবার জন্য।

বাপী হবার আগেই পাইকপাড়ার লালাবাবু লেনে বাসা করা হয়েছিল। আমি শ্বশুরবাড়ীর ঘর করতে এলাম। তার আগেও আমার জানবার কথা নয় কার টাকায় সংসার চলে বা কে কত রোজগার করেন। কারণ তখনও দেখেছি বোনেরা মাসের পর মাস বাপের বাড়ী থাকেন। আমার বাক্স থেকে শ্রীপ্রীতিকুমার বোনেদের জন্য ভাগ্নীর জন্য শাড়ী বের করে দিয়েছেন। আমার কখনও মনে হয়নি আমার কিছু কম পড়ে যাচ্ছে। আমাদের শিক্ষা ছিল এইরকম। আমার শ্বশুরবাড়ীর লোকেরাও খুব ভদ্র ও মার্জিত ছিলেন।

যাইহোক, সংসার করতে এসে সব খাটনি মাথায় করে নেবার চেষ্টা করতাম। আমার বাবার শিক্ষা ছিল– "কোনও দিন যেন নালিশ না শুনি। শাশুড়ী কাজ করবেন আর তুমি শুয়ে থাকবে এমন যেন না হয়।" সে কথা মাথা পেতে নিয়েছিলাম।

লালাবাবু লেনে একটি বিশাল ঘর ও একটি ঘেরা বারান্দা ছিল। শ্রীপ্রীতিকুমার আমাকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন- "বড় বড় ভাইদের সামনে স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা ঘরে থাকব? এ হয়না। তুমি সবার সঙ্গে বড় ঘরে থাকবে।" তাই সই। দেখলাম আমার শ্বশুরবাড়ীর সদস্যদের কাছ থেকে সামান্যতম প্রতিবাদ উঠল না। তখন বয়স ছিল কম, ভদ্রতা-বোধ ছিল প্রবল। তাছাড়া নিজের জন্য কিছু বলতে আত্মসম্মানে বাধতো, আর গুরুজন হিসাবে শ্রদ্ধাবোধ থাকাতে তাঁর বাক্য আমার কাছে বেদবাক্য ছিল। শ্রীপ্রীতিকুমার আমার সাথে কথা বলবার ফাঁক খুঁজতেন। অসম্ভব রোমান্টিক ছিলেন। খাবার পর সামনের বিশাল ছাদে গিয়ে বসতেন, আমাকে ডাকতেন। তখন আমারও কথা বলবার গল্প করবার ঝোঁক কম ছিল না। ফলে গল্প করতে করতে একটু রাতও হয়ে যেতো। স্বাভাবিক ভাবে অপরে মনে করতে পারতেন আমি কারো নামে তাঁর কাছে লাগানি ভাঙ্গানি করছি। আজ আর সেকথা তুলে লাভ নেই। মোদ্দা কথা একটা জিনিষ সংসার করতে এসে বুঝে নিয়েছিলাম শ্রীপ্রীতিকুমারের রোজগার কম এবং তার জন্য তিনি মনোবেদনায় ভুগছেন। যৌথ সংসার আর আমার করা হলো না। মাথা নীচু করে ভাত গেলা আমার অভ্যাস ছিল না। তাই আমার চাকরী খোঁজা শুরু হলো। বাপীকে তিন মাসের নিয়ে আমি প্রথম চাকরী করতে গেলাম বাতানল কো-এডুকেশনাল হাই স্কুলে। সেই আমার পথ চলা শুরু। আজও চলেছি। এ আর শেষ হবেনা কোনও দিন। তবে নিজের জন্য হাত পাতিনি আত্মীয়-স্বজনের কাছে। আজও চেষ্টা করি হাত যাতে না পাততে হয় কোনদিন। কারও সাথে পাল্লা দিয়ে কাউকে অর্থ সাহায্য করার চেষ্টা করিনি, যা করতে পেরেছি, আমি বড়-- আমার করা উচিত-- এই বোধ থেকে করেছি। আমার এক class friend ছেলে বলেছিল ভাগ্নে-ভাগ্নীরা মামার কাছে হাত পাতে দেখেছি, মামীমার কাছে কিছু চায় কখনও দেখিনি।

গত ১৯৮৭ সনে আমার শাশুড়ি খুবই অসুস্থ ছিলেন। শ্রীপ্রীতিকুমার সদ্য প্রয়াত হয়েছেন। আত্মীয়-স্বজনের মুখোমুখি হতে চাইনা। সারাদিন R. G. Kar Hospital-এ পড়ে থাকি। Visiting hours-এ বাড়ী চলে আসতাম। এরমধ্যে জনৈকা আত্মীয়া প্রশ্ন করলেন, "বড় বৌকে দেখা যাচ্ছে নাতো? সে আসেনি?" আমার ভাগ্নী তুলসীরা সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলো, "মামীমা তো সারাদিন থাকেন। যা করবার তিনি ঠিক করেন।" এই হচ্ছে অবস্থা! হেনাদির ছেলেমেয়েরা আমাকে একটু ভালই বাসে মনে হয়। হয়ত সেইজন্যই শেষকালে শ্রীপ্রীতিকুমার বলেছিলেন,

“তুমি হেনার কাছে গিয়ে থেকো। ওর ছেলেরা আছে। তোমার কোনও অসুবিধে হবে না।”

কত ছোট ছোট কথায় ভবিষ্যতটা বোঝাবার চেষ্টা করতেন। বুঝতে পারিনি। আমার বোধশক্তি একটু কম। আজও আমি অনেক কিছু বুঝতে পারিনা।

দীর্ঘ বত্রিশ বছর ধরে সংগ্রাম করছি। ক্লান্ত হলেও বাঁচোয়া নেই। একটার পর একটা সমস্যা এসেছে। শ্রীপ্রীতিকুমার প্রয়াত হবার পাঁচ দিন থেকে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার সমাধান কতদিনে হবে জানিনা। শুধু একটা কথা তিনি বলেছিলেন, “দেহ থাকতে যে কাজ করা যায় না, দেহ ত্যাগ করবার পর যোগীরা সে কাজ অনেক বেশী করে করতে পারেন।” কথাটার অর্থ বুঝিনা – শুধু জানতে ইচ্ছে করে সত্যি যদি তিনি আমাদের এভাবে রক্ষাই করছেন, তাহলে আমি যে সম্পদ হারিয়েছি তা’ আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন না কেন? আমাকে বড্ড বেশি স্নেহ করতেন। আমার চোখে জল দেখলে তাঁর বড় বেশি কষ্ট হতো। তিনি কি দেখতে পাচ্ছেন না আমি কত দুঃখ পাচ্ছি? অবশ্য এটা তো ঠিক আমার সন্তান তো আমাকে ছেড়ে যায়নি। গেলেই বা কি করতাম? মানুষের তো সবই সয়ে যায়। সহ্যশক্তি তো আমার বেশি কোনও দিনও ছিলো না। দরকারও হয়নি। শ্রীপ্রীতিকুমারকে নিবেদন করলেই আমার সমস্যার সমাধান হতো। এখন সেই আমি সবই তো মেনে নিচ্ছি। যাদের চাইছি তারা যদি কাছে না আসে তাও সইবে। শুধু দেখতে চাই শ্রীপ্রীতিকুমার আর কত ভাবে আমাকে ঘিরে রাখবেন; আর কত ভাবে আমাকে গড়ে তুলবেন। বলেছিলেন, “সব পরিণতি তুমি দেখে যাবে।” সেইটারই অপেক্ষা।

– – – – – – – – – – – – – –

(** রচনাকাল – ডিসেম্বর, ১৯৮৯)

“হে ঈশ্বর, সকলের তুমি যে আশ্রয়,
প্রকাশিত হও মোর কাছে,
সর্বভাবে প্রাপ্ত হও তুমিই আমারে।” ...

– তৈত্তরীয় উপনিষদ

নাম জপের মধ্যে যথেষ্ট শক্তি থাকে।

– শ্রী অরবিন্দ

** **

জপের ফল হতে পারে দুই রকম ভাবে – এক হল মনের মধ্যে আরাধ্য দেবতার প্রকৃতি, শক্তি, সৌন্দর্য, মাহাত্ম্যের কথা স্মরণ করে এবং তা চেতনার মধ্যে জাগিয়ে তুলে – এই হল মনের পন্থা। আর আছে হৃদয়ের পন্থা, হৃদয়ের মধ্যে পুরো ভক্তির ভাবটিকে জাগ্রত ও জীবন্ত রেখে ভাবপ্রবাহ দিয়ে। হয় মনের কিংবা প্রাণের ক্রিয়া থাকবে তার মধ্যে। কিন্তু তার মধ্যে যদি মন নীরস ও প্রাণ অশান্ত হয়ে পড়ে তাহলে জপের অবলম্বন হারিয়ে যায়। তৃতীয় একটি উপায় আছে বটে, তা হল মন্ত্রের বা নামেরই শক্তির পরে নির্ভর করা; কিন্তু তাতে সেই মন্ত্রশক্তি বা নামশক্তির স্পন্দন আভ্যন্তরীণ সত্তার মধ্যে প্রবেশ করা চাই, তখন হঠাৎ এক সময় সেই দেবতার উপস্থিতি বা স্পর্শ এসে পড়তে পারে।

– শ্রী অরবিন্দ

** **

হঠাৎ যখন দেখ যে সব কিছু তোমার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে – তুমি কেবল ভুল কাজ করছ, অমনোযোগী হয়ে পড়ছ, বিরুদ্ধ-তরঙ্গ এসে তোমার চেষ্টার সকল কাজকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে, – তখন যদি তুমি তোমার মন্ত্র উচ্চারণ করে কাউকে ডাকতে অভ্যাস করে থাক তাহলে তাতে অসাধারণ রকমের ফল হতে পারে। তোমার মন্ত্রটি তুমি হয়তো আপনা হতে বেছে নাও, কিংবা কোন বিপত্তিকালে হয়তো আপনা হতে সেই মন্ত্রটি এসে পড়তে পারে। যখন দারুণ কোন বিপদের মুখে পড়েছ, উৎকণ্ঠা এবং উদ্বেগে কি করবে ঠিক করতে পারছ না, হয়তো সেই মন্ত্রের শব্দটি আপনা হতে এসে হাজির হতে পারে। প্রত্যেকের পক্ষে সে মন্ত্র আলাদা হয়। কিন্তু বিপদ সম্মুখে এলেই তুমি বারবার সেই মন্ত্রটিকে আবৃত্তি করতে থাক, না করে পার না। যেমন, তুমি যখন দেখছ যে অসুস্থ হয়ে পড়ছ, তোমার কাজকর্ম খারাপ হচ্ছে, হয়তো মন্দ কিছু তোমাকে আক্রমণ করতে আসছে, তখনই সেই মন্ত্র উচ্চারণ কর – কিন্তু তা আপনা হতে ভিতর থেকে উঠে আসা চাই, ভেবে চিন্তে বলা নয়। যে মন্ত্রটি তুমি বেছে নাও তা আপনা হতে তোমার আস্পৃহার ভিতর থেকে আসে। তা একটি বা দুটি বা

তিনটি শব্দ হতে পারে অথবা একটা পদ হতে পারে, ব্যক্তির উপর নির্ভর করে, কিন্তু সেই শব্দটি তোমার মধ্যে এক বিশেষ অবস্থাকে জাগিয়ে তুলবে। তেমন যদি হয় তাহলে বিনা ক্ষতিতে তুমি তোমার বিপদকে অতিক্রম করে যাবে। যদি বিপদ কিংবা আক্রমণ মারাত্মক রকমেরও হয়, যেমন কেউ হয়ত তোমাকে খুন করতে আসছে, তখন অধৈর্য না হয়ে শান্ত মনে যদি তোমার মন্ত্রটি আবৃত্তি করতে থাক তাহলে কেউ তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। অবশ্য তখন নিজেকে সংযত রাখতে হবে, গাছের পাতার মত কাঁপতে থাকলে চলবে না; তুমি ঐকান্তিক মনে মন্ত্র আবৃত্তি করে যাবে, তার শক্তি অতি প্রবল হবে। তবে তা আপনা হতে আসা চাই; দারুণ বিপদের কালে (মানসিক বা কায়িক বা হৃদয়ের কিছু - যাই হোক না) সেই দুটি তিনটি মন্ত্র বাক্য হঠাৎ ম্যাজিকের মত জেগে উঠবে; এটা স্মরণ রেখে অভ্যাস করে নিতে হবে। অভ্যাস হয়ে গেলে তখন দরকারের সময় আপনা হতেই সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র জেগে উঠবে। তখন তার ফল হবে আশ্চর্য। কিন্তু সেটা কৃত্রিম হলে চলবে না, ভেবেচিন্তে সাব্যস্ত করলে চলবে না যে "এবার আমি এই মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করি," কিংবা কেউ তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিলে চলবে না যে "এইবার অমুক মন্ত্র জপ করা ভাল"। সেটা তার পক্ষে ভাল হতে পারে, কিন্তু সকলের নয়।

- শ্রীমা

** **

নিয়মিতভাবে যে মন্ত্র জপ করবে তার পক্ষে সেটা ভিতর থেকে আপনা হতে আবৃত্তি হতে থাকবে, তার মানে আভ্যন্তরীণ সত্তাতে সে মন্ত্র চলে গেছে। এর ফল অনেক ভাল হয়।

- শ্রীঅরবিন্দ

** **

ওঁ শব্দটি হল মন্ত্র, এই শব্দ-প্রতীকের দ্বারা ব্রহ্ম-চেতনার চতুর্বিধ সকল রাজ্যের তুরীয় থেকে বাস্তবের স্তর পর্যন্ত প্রতিফলিত হয়। মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা আভ্যন্তরীণ চেতনার মধ্যে স্পন্দন জাগে, তাতে সেই প্রতীক বস্তু সম্বন্ধে একটা উপলব্ধি আসে যা ঐ মন্ত্রের মধ্যেই নিহিত থাকে। ওঁ মন্ত্রের দ্বারা সেই অদ্বিতীয় চেতনার সর্ব বস্তুতে অবস্থিতির উপলব্ধি চেতনার মধ্যে জাগ্রত হয়, সর্ব সত্তায় ও বাস্তবোত্তর সকল জগতে, অতিচেতন জগতে এবং পার্থিব অস্তিত্বের উপরকার

পরাৎপর জগতে তাঁর উপস্থিতি প্রতিভাত হয়। যারা এই মন্ত্র জপ করে তাদের কাছে সেটাই কাম্য।

– শ্রীঅরবিন্দ

** **

এই যোগের পক্ষে বিশেষ কোন নির্দিষ্ট মন্ত্র নেই, মন্ত্রের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না, যদিও সাধনার পক্ষে সহায়ক হলে সাধকেরা যে কোন মন্ত্র ব্যবহার করতে পারে। এতে গুরুত্ব দেওয়া হয় চেতনার আস্পৃহার উপরে এবং মনে প্রাণে হৃদয়ে ইচ্ছাতে এবং সমগ্র সত্তায় একাগ্রতা স্থাপন করাতে। তবে যদি কোন মন্ত্র তোমার পক্ষে সুবিধাজনক হয় সে মন্ত্র তুমি ব্যবহার করতে পারে। ওঁ মন্ত্রটি যদি সমুচিতভাবে ব্যবহার করা হয়(যন্ত্রের মত নয়) তাহলে তাতে বিশ্বচেতনার দিকে হৃদয়মনের উন্মীলন হতে পারে এবং সে চেতনার অবতরণও হতে পারে।

– শ্রীঅরবিন্দ

** **

আমাদের সাধনাতে সাধারণতঃ মায়ের নাম কিংবা আমার এবং মায়ের নাম ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

– শ্রীঅরবিন্দ

** **

গায়ত্রী মন্ত্রের শক্তিতে দিব্যসত্যের আলোক মেলে। এটি হল জ্ঞানের মন্ত্র।

– শ্রীঅরবিন্দ

DO NOT COPY

তান্ত্রিক সাধনার মূল কথা হইতেছে - বিষকে অমৃত করিয়া তোলা। যে সকল বস্তু আশ্রয় করিয়া, যে সকল বৃত্তি-প্রবৃত্তির অনুসারে চলিয়া মানুষের সাধারণতঃ স্বভাবতঃ অধোগতি হয়, ঠিক সেই সকল বস্তু সেই সকল বৃত্তি-প্রবৃত্তিকে ধরিয়াই তন্ত্র চায় মানুষকে উন্নীত করিতে। তন্ত্রোক্ত পঞ্চ-মকার জগতে মানবজীবনে এইরকম প্রতিনিধিসম (typical) বিষ মাত্র। পশুজীবনের এইসব উপকরণের সহায়ে তন্ত্র দেব-জীবনের সাধনা করিতে চাহিয়াছে। এখন প্রশ্ন, তন্ত্রের এ-রকম অদ্ভুত সাধনা, এ-রকম উৎকট পরিকল্পনা কেন? আর ইহাতে সিদ্ধির সম্ভাবনাই বা কতখানি?

মানুষের একটা চলিত বিশ্বাস এই যে, বিষ চিরকালই বিষ, জীবনের শত্রু, সুতরাং সর্বদা সর্বাবস্থায় পরিবর্জনীয়, কখনও কোন প্রকারে যেন দেহের রক্তে উহা প্রবেশ না করে। বেদান্তের, সাধারণ প্রচলিত সকল অধ্যাত্মবাদের, ধর্মবাদের, নীতিবাদের সাধনার মধ্যেও আছে এই রকম এক বিশ্বাস। বৈদান্তিক সাধনা মানুষকে সরাসরি দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে - একদিকে মানুষের সাধারণ প্রাকৃত বৃত্তি, আর একদিকে তাহার দিব্য ভাগবত প্রেরণা। এ দুইটির একটি অপরের একান্ত বিরোধী। সুতরাং সাধনার পথ হইতেছে - দিব্যভাবকে জাগাইয়া ফুটাইয়া তুলিবার উপায় হইতেছে প্রাকৃত ভাবকে দূরে রাখা, দমন করা, নিগ্রহ করা, সমূলে উৎপাটন করা। প্রাকৃত যাহা, নিম্ন স্তরের যাহা, তাহা চিরকালই প্রাকৃত, নিম্নস্তরের । তাহাকে কখনও এতটুকু প্রশ্রয় দিবে না, দিলেই তাহা 'হবিষা কৃষ্ণ বর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে', আর আগুনের মতই সকল উর্দ্ধমুখী বৃত্তিকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। বিষ আর অমৃত দুইটি পৃথক জিনিষ। অমৃতকে যে চায়, সে যেন আর বিষকে স্পর্শও না করে।

তন্ত্র কিন্তু বিষ আর অমৃতকে - প্রাকৃত জীবনকে আর অধ্যাত্ম জীবনকে এমন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখে না। অবশ্য, বেদান্ত-সাধনাও কার্যতঃ প্রাকৃত বা সাধারণ জীবনের অনেকখানি স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং উহার মধ্য দিয়া উহাকে কাটাইয়া দিব্য জীবনে উপনীত হইতে চেষ্টা করিয়াছে। একান্ত যাহা ভোগায়তন, তাহার পরিসর যত সঙ্কীর্ণ সম্ভব, ততখানি করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু কর্মের চিন্তার প্রয়োজনীয়তা কার্যকারিতা মানিয়াই লইয়াছে। অন্য কথায় বেদান্ত

মানুষের পশুভাবকে নাকচ করিয়াছে। মানুষের মধ্যে এই পশুই সকলের নীচের স্তরে, ইহার জোরও সকলের অপেক্ষা বেশী। তাই বেদান্ত ইহাকে সভয়ে দেখিয়াছে, এ শত্রুর শেষ সে রাখিতে চায় নাই। কিন্তু মানুষের মধ্যেও যাহা আর একটু উপরের স্তরে, যাহা লইয়া তাহার মানুষভাব, অথবা যৎকিঞ্চিৎ পরিমাণে পশুভাব মিশ্রিত মানুষভাব, তাহাকে দিব্য বা অধ্যাত্ম-ভাবের তেমন পরিপন্থী বলিয়া মনে করে নাই, তাহাকে সাধনার সহায় বলিয়া ধরিয়াছে।

উপরে উঠিতে গেলে নীচের একটা আশ্রয় চাই। ভাগবত স্বভাব হইতেছে তুরীয় বস্তু। মানুষ আমরা তাহা বুঝিতে পারিনা, ধরিতে পারি না। তাই চাই এপারের, এই পরিচিত মানুষ-জীবনের মধ্যে এমন জিনিষ যাহা সেই ওপারের দেব-জীবনের ঈঙ্গিত বা প্রতিচ্ছায়া। মানুষের মধ্যে জানাশুনা যে-সব শ্রেষ্ঠ-বৃত্তি, তাহাকেই দিয়া সেইজন্য দেবতার বা সিদ্ধের ধর্মের প্রতীক করিয়া সাধনা আরম্ভ করি। শরীরকে নিরাময়, সুস্থ সবল রাখিবার পক্ষে যেমন, সেই রকম এ-সকল অধ্যাত্মজীবনের হইতেছে সুপথ্য বা টনিক।

তন্ত্র কিন্তু এভাবে সুপথ্য বা পুষ্টিকর জিনিষ দিয়া অধ্যাত্মকে, মানুষের মনুষ্যত্বকে, দেবত্বকে সজীব সবল করিতে চাহিতেছে না। সে লইয়াছে বিষের আশ্রয়। বিষ সকল সময়ে সকল অবস্থায় প্রাণান্তকর নয়। অল্প পরিমাণে বিষ যে জীবনের পক্ষে অনেক সময়ে একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা সকলেই জানেন। অন্য কোন ঔষধ আর যখন ফলদায়ক হয় না, তখন চিকিৎসকেরা বিষেরই আশ্রয় লইয়া থাকেন। বিষের মধ্যে এমন একটি জিনিষ আছে, যাহা বিশেষভাবে উপযুক্ত পরিমাণে শরীরের মধ্যে টানিয়া মিশাইয়া লইতে পারিলে, এত কার্যকরী এত ফলপ্রদ হয় যে, আর কিছুতেই তাহা হয় না। তন্ত্র বলিতেছেন, শুধু তাহাই নয়, কেবল নিয়মের ব্যাভিচার নয়, এ তথ্যটি সর্বত্র সাধারণ ভাবেও প্রয়োগ করিতে পারা যায়। জীবশরীরের একটা সহজ ধর্মই এই যে, বিষকে সে কেবল উদ্গীর্ণ করিয়াই দেয় না, বিষকে হজম করিবার শক্তিও তাহার আছে। শরীর বিষের স্পর্শ হইতে দূরে থাকিয়া, বিষ নির্মুক্ত হইয়া সুস্থ সবল থাকে, সত্য কথা; কিন্তু বিষকে ধরিয়া সে রকম ভাবে যদি হজম করিতে পারি, তবে শরীর এক সম্পূর্ণ নূতন রূপে গড়িয়া উঠে, তাহা হয় - মূর্ত স্বাস্থ্য, মূর্ত তেজ। বিষ জিনিষটি আর কিছুই নয়, উহা হইতেছে ঘনীভূত (concentrated) অমৃত। সাধারণ অবস্থায় দুর্বল, অপুষ্ট আধার ইহা ধারণ করিতে পারে না, ইহার ঝাঁঝে পুড়িয়া

যায়, কিন্তু কোন রকমে যে ঐ কাজটি করিতে পারিয়াছে, সে নীলকণ্ঠ মহাদেবেরই মত মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছে। তন্ত্র সাধনার সমস্ত কৌশল তাই বিষকে রূপান্তরিত করা, বিষের স্বরূপ-শক্তিতে আধারকে সঞ্জীবিত করা।

যাহাকে আমরা ইন্দ্রিয়বৃত্তি বলি, যাহার নাম দেই পশুভাব, তাহার সাধারণ স্বভাব হইতেছে - মানুষকে নীচের দিকে টানিয়া ধরা, উপরের প্রতিষ্ঠানকে ঢাকিয়া অধঃস্তরে মানুষকে ডুবাইয়া রাখা। কিন্তু তাহা ইন্দ্রিয়বৃত্তির বা পশুস্বভাবের আত্মগত দোষ নয়। তাহার কারণ এই মানুষের শিক্ষা দীক্ষা, মানুষের অভ্যাস। আধার এই ধরণে গঠিত হইয়াছে, তাহার উপকরণ এই প্রণালীতে সাজানো হইয়াছে যে, 'মাত্রাস্পর্শে' তাহারা অভিভূত হইয়া পড়ে, অন্ধভাবে আত্মহারা হইয়া ছুটে - বাহিরের দিকে, নীচের দিকে। তাই বলিয়া এটি যে চিরন্তন সনাতন ধর্ম, তাহা মনে করিবার কিছু নাই। এটি সংস্কার মাত্র; এ সংস্কারকে পরিবর্তিত করা যায়। ইন্দ্রিয়বৃত্তির পশুভাবের সহিত অধ্যাত্মবৃত্তির দেবভাবের দ্বন্দ্বটাই চরম সত্য নয়; উহাদের আছে একটা নিভৃত গুপ্ত সামঞ্জস্য, একত্ব। জীব ইন্দ্রিয়বৃত্তির দাস যখন তখনই সে পশু, কিন্তু যখন প্রভু, তখনই সে দেবতা। এই প্রভু হওয়া, সম্রাট হওয়াই তন্ত্রের লক্ষ্য। যে শুধু দমন করিতে নিগ্রহ করিতে জানে, সেই যে প্রভু তাহা নয়, এমন কি যে নিয়মমত শাসন করিতে পারে, সুব্যবস্থা-সুশৃঙ্খলায় সকল পরিচালিত করিতে পারে, সেও আদর্শ প্রভু বা সম্রাট নয়, আদর্শ প্রভু হইতেছেন তিনি যিনি দাসকে শুদ্ধির মধ্য দিয়া মুক্তির দিকে চালাইয়া লন, আপন প্রভুত্বের ঈশ্বরত্বের প্রতিভা নীচের স্তরে স্তরে সমানভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়লাস্যের মধ্যে, স্থূলতম প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন দিব্যজীবনের গতি কোন সূক্ষ্ম তুরীয় সত্তা লুকাইয়া আপনহারা হইয়া আছে, তাহাকেই জাগাইয়া প্রকটিত করিয়া ধরিতে হইবে। পথ কঠিন সন্দেহ নাই; ক্ষুরস্য ধারা ইব নিশিতা দুরত্যয়া; কিন্তু আদর্শটিও যে চরম। বিষ লইয়া খেলা বিপজ্জনক, কিন্তু যে শুধু জীবন চায় না, যে চায় অমৃত, তাহার আর কোন উপায় নায়, নান্যঃ পন্থা। Extremes meet - অতি খাঁটি কথা। নীচে একেবারে চরমে যদি চলিয়া যাও, তবু চক্ষু যদি থাকে, দেখিবে - একেবারে উপরেরই চরমে গিয়া পৌঁছিয়াছ। জীবনের পরিপূর্ণ পূর্ণতা - এই দুইকে মিলাইয়া ধরিয়া। পূর্ণ ত্যাগ ভোগে যাইয়া মিশিয়াছে - তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা; পূর্ণ ভোগেও আবার ত্যাগে যাইয়া সার্থক হইয়াছে- ভোগে! যোগায়তে সম্যক্। পূর্ণভাবে ত্যাগ করিতে মানুষের শক্তি নাই, পূর্ণভাবে

ভোগ করিতেও আবার সাহস নাই। তাই সাধারণতঃ দেখি, কিছু ত্যাগ আর কিছু ভোগ মিশাইয়া মানুষ অপেক্ষাকৃত সুগম এক পথ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। তাই তাহার নীতির, ধর্মের, এমনকি আধ্যাত্মিকতার আদর্শের মধ্যেও লক্ষ্য করি এই দুই-এর মূলগত সামঞ্জস্য ও একত্ব নয়, কিন্তু একটা সাময়িক অবস্থানুযায়ী বন্দোবস্ত - রফা, জোড়াতালি। মানুষ তাই সচ্চরিত্র, ধার্মিক, এমনকি সাধু হইতে পারিয়াছে, কিন্তু দেবতা - অমৃতস্য পুত্রাঃ- হইয়া উঠিতে পারে নাই।

তন্ত্রের সাধনা তাই হইতেছে - প্রকৃতির সাধনা। প্রকৃতিকে - অন্ধ তামসিক প্রাকৃত-শক্তিকে সে প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছে, গোড়ায় অকুণ্ঠিতভাবে পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে। যে অসীম বিপুল বিরাট শক্তি জগতের মানুষের আদিম স্বভাবের তলদেশে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাকে উঠাইয়া - প্রবুদ্ধ করিয়া, উপরের উৎসের চিন্ময় মহাশক্তির দিকে চালাইয়া লইতেছে। তন্ত্রের ভাষায় কুণ্ডলিনী শক্তিকে তুলিয়া সহস্রদলের শক্তিতে রূপান্তরিত করাই অধ্যাত্মের, অমৃত জীবনের সাধনা। সেজন্য এইটুকু সর্বদা স্মরণে রাখিতে হইবে যে, চিন্ময় তপঃশক্তি এমন একটা কিছু পদার্থ নয়, যাহা প্রাকৃত তামস শক্তি হইতে বিযুক্তভাবে দূরে শূন্যে কোথাও ঝুলিয়া আছে, প্রাকৃত শক্তিকে নিঃশেষে কাটিয়া ছাঁটিয়া ফেলিয়া দিবে, লোপ করিয়া দিলেই উহা ফুটিয়া উঠিবে। -না তাহা নহে। উভয়ে একই জিনিষের দুই রূপ, অবস্থা বিশেষে দুই রকম প্রকাশ। পশুভাব আর দেবভাব, স্থূল আর তুরীয়, 'ইহ' আর 'অমুত্র', একই জিনিষের দুই দিক হইতে দেখিবার দুই ভঙ্গি। 'এখানে' যাহা আছে, 'সেখানে'ও তাহাই আছে, এখানে যাহা নাই, তাহা সেখানেও নাই, কোথাও নাই।

আদিম মানুষ, মানুষের প্রাকৃত স্বভাব, তাহার গোড়ার প্রতিষ্ঠা কতকগুলি সহজাত বৃত্তি বা প্রেরণা (instincts) লইয়া গঠিত। এই বৃত্তিগুলির উপরই তাহার জীবনের পত্তন; ইহাদের উপরেই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে - তাহার ঐহিক লীলাসৌধ, আর সে সৌধের পারত্রিক চূড়াটি। এই ধরণের প্রধানতঃ আমরা তিনটি বৃত্তি দেখিতে পাই। প্রথম হইতেছে বাঁচিয়া থাকা বা আত্মরক্ষণ (Self-preservation), দ্বিতীয় হইতেছে গড়িয়া উঠা বা আত্মপোষণ (Self-aggrandisement); আর তৃতীয় হইতেছে ভোগ করা বা আত্মতোষণ, আত্মজনন (Self-reproduction)। মানুষ জন্মিলেই তাহার চেষ্টা হয় - সর্বপ্রথম কি করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে হয়, কি করিয়া দেহটাকে বজায় রাখা যায়, এইটিই

তাহার প্রধান প্রথম মৌলিক প্রেরণা। কিন্তু কোন রকমে বাঁচিয়া থাকা হইতেছে –মানুষের প্রয়াসের ন্যূনতম পরিমাণ (minimum)। এটুকু সকলের আগে দরকার হইলেও, ঐটুকুতেই সে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না, সে চায় আরও কিছু। বাঁচিয়া থাকিতে হইবে; কিন্তু বেশী করিয়া (richly), আপনাকে জড়াইয়া ছড়াইয়া বাঁচিতে হইবে। ইহাও আবার শেষ নয়, শুধু জীবন নয়, সমৃদ্ধ জীবনও নয়, চাই আবার সুখের আনন্দের গভীর জীবন। মানুষের প্রাকৃত বৃত্তির এই ত্রিধারা। আর সকলের শেষে বা সকলের উপরে সকলকে ধরিয়া রহিয়াছে – আর একটি বৃত্তি – মানুষের অহমিকা, আমি-বোধ। বাঁচিব, ক্ষমতা দেখাইব, ভোগ করিব – আমি আমার জন্য; আমি আমার দেহ-রাগ, আমার অধিকার-লিপ্সা, আমার কামতৃষ্ণা – এই হইতেছে পূর্ণ প্রাকৃত মানুষ।

তন্ত্র বলিতেছেন, বেশ কথা, ঠিকই ত', ইহা লইয়াই মানুষের প্রতিষ্ঠা। এ সত্যকে অস্বীকার করার দরকার নাই, উচিতও নয় – ইহাকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, ভাল করিয়া বুঝিয়া এই সত্যেরই প্রয়োগ করিতে হইবে। দেহটি যেমন করিয়া হউক রক্ষা করিব, অধিকার বিস্তৃত করিব, আনন্দের ভাণ্ডার লুটিয়া খাইব – এর অর্থ কি? এর অর্থ কি নয়, চাই জীবন, জীবনের পরিসর, জীবনের গভীরত্ব? অন্য কথায় – চাই জীবনের স্থিতি, শক্তি ও আনন্দ। কিন্তু প্রশ্ন এখন – কোথায় কি ভাবে পাইব – পূর্ণ জীবনের পূর্ণ স্থিতি, পূর্ণ শক্তি, পূর্ণ আনন্দ? ফলতঃ দেহকে একান্ত করিয়া মানুষ দেহের মধ্যে যখন স্থিতি চায়, প্রাণের মধ্যে শক্তি চায়, হৃদয়ের মধ্যে তৃপ্তি চায়, তখন বাস্তবিক পক্ষে সে চাহিতেছে – দেহকে আশ্রয় করিয়া, দেহের মধ্যে সৎ, প্রাণের মধ্যে চিৎ, আর হৃদয়ে আনন্দ। মানুষের জীবনৈষণা, কর্মৈষণা, ভোগৈষণা হইতেছে – তাহার স্থূল আধারের বেলাভূমে, তাহারই নিভৃত সন্ময়, চিন্ময়, আনন্দময় সাগরের দূর-প্রসারিত ঊর্মিবিক্ষেপ – এইখানে এই এপারের ভূর্ভুবঃস্বঃ লোকত্রয়ের মধ্যে ওপারের সেই সত্য, তপঃ ও জনঃ লোকের আবির্ভাব-প্রয়াস।

মানুষ যে তবে এই ভিতরের সত্যপ্রেরণা, সত্যৈষণাকে ভুলিয়া হারাইয়া তাহার ছায়াটিকেই ধরিয়া বসে, তাহার কারণ – তাহার অহমিকা, তাহার অহংজ্ঞান। মানুষ যেই বলে ও বোধ করে – 'আমি', তখনই সেই আমির ভিতর দিয়া উপরের ভূমার আসল প্রেরণা সঙ্কুচিত সঙ্কীর্ণ হইয়া, 'অন্ধ' হইয়া জমাট হইয়া নীচে দেখা দেয়; তখনই শরীরের বাহ্য দাবীকে, ইন্দ্রিয়ের সহজাত প্রেরণার বাহ্য অধিকারকে একান্ত করিয়া সর্বস্ব করিয়া আঁকড়িয়া ধরি। অহঙ্কারই

বিশ্ব হইতে পূর্ণ অখণ্ড সত্য হইতে আমাকে কাটিয়া ভিন্ন করিয়া দেয়, শরীরের – ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ দাবী, অখণ্ড অধিকারটি ভুলাইয়া দেয়।

সুতরাং বিষকে অমৃতে, ইন্দ্রিয়কে অতীন্দ্রিয়ের মধ্যে রূপান্তরিত করিবার কথা আমরা যে বলিয়াছি, তাহার মূল সমস্যা হইতেছে – এই অহঙ্কারের পরিবর্তন, রূপান্তর সাধন। এ সাধনায় নিগ্রহের, দমনের ব্যবস্থা নাই, সুতরাং অহঙ্কারেরও একান্ত নিগ্রহ বা দমনের প্রয়োজন নাই – অহঙ্কারেরও চাই রূপান্তর। কারণ, অন্যান্য সহজাত বৃত্তির মত অহঙ্কারেরও আছে – একটা সত্যরূপ, একটা দিব্যসত্তা অহমিকার, অহঙ্কারের সেই রূপ, সেই সত্তা হইতেছে – ব্যাষ্টির অন্তর্যামী পুরুষ, যে মূল ভাব লইয়া প্রত্যেকে ভগবানের এক এক বিভূতি, যে কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া এক প্রথমে নানা হইতে আরম্ভ করিল, সমতা বৈচিত্র্য লাভ করিল, অন্য কথায় সেটি হইতেছে শিবের জীবভাব – এই খণ্ডিত অন্ধ বদ্ধ জীব নয়, কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যে বিভিন্ন বিশিষ্ট মুক্ত যে জীব; শিবের সহিত অভেদ থাকিয়াও যে জীব জীবনের জগতের একটা পৃথক প্রকরণ গড়িয়া তুলিতেছে, এক একটা বিবর্তন ধারা সৃষ্টি করিতেছে। শিবাত্মক মুক্ত জীব বদ্ধ অহং হইল – ইন্দ্রিয়ের স্থূলের সৃষ্টির জন্য। কারণ, এইখানেই তাঁহার শেষ পরিণাম, তাঁহার দৃষ্টির সীমান্তরেখা। অমৃত-সাগর ঘোলাইয়া উঠিল – হলাহলের জন্ম দিবার জন্য। এই হলাহল যে আস্বাদন করিয়াছে, অমৃতও সেই পান করিবে। আর সে সাহস যাহার নাই, সে আর যাহাই হউক না কেন অমৃতের পূর্ণত্বের অধিকারী হইবে না।

আলুলায়িত কুন্তলা। লেলিহান রসনা, বিবসনা, ঘোরা কালী হইতেছেন – কুণ্ডলিনী শক্তি, মূর্ত প্রাকৃত শক্তি; আর ঐ যে পদতলে পড়িয়া নিষ্কম্প নির্মল শুভ্র জ্যোতির্ময় পুরুষ, তিনি হইতেছেন – উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সহস্রারস্থ স্থিরতপঃশক্তি – তুরীয় ব্রহ্মশক্তি। প্রাকৃত শক্তিকে তুরীয় শক্তির সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে, উভয়কে এক মহাযোগের ক্ষেত্রে সম্মিলিত করিয়া ধরিতে হইবে – ইহাই তন্ত্রসাধনা। সে জন্য আগে কালীর তর্পণ চাই; চাই এমন কাপালিক সাধক, যিনি আপনার মধ্যে সেই শত স্কন্ধ সহস্র স্কন্ধ অসুর অহংকারকে বলি দিতে দিতে চলিবেন, আর সে ছিন্নমুণ্ডকে কালীরই গলার হার করিয়া পরাইয়া দিতে থাকিবেন।

অহঙ্কার নির্মুক্ত হইয়া শিবভাবে ভিতরের জীবটি প্রকৃতির সহিত যখন সম্বন্ধ স্থাপন করিতে অগ্রসর হইতেছে, তখন প্রকৃতির কোন অঙ্গ হেয় বলিয়া ছাঁটিয়া দিবার প্রয়োজন হয় না। বরং হেয় বলিয়া যাহা সচরাচর বিবেচিত, তাহাকেই সকলের আগে বরণ করিয়া লইতে হয়, কারণ বর্জন চাই না, চাই – শুদ্ধি বা রূপান্তর। আর এ শুদ্ধি বা রূপান্তরের অর্থ – অভূতপূর্ব অভিনব একটা কিছু সৃষ্টি করা নয়, এ হইতেছে – তরল করিয়া দেওয়া, ছড়াইয়া দেওয়া, মুক্ত করিয়া দেওয়া – হৃদয়গ্রন্থি মধ্যে জমাট যাহা, তাহাকে টুটাইয়া ভাঙিয়া ভূমায় বিস্তৃত করিয়া ধরা, তবেই উহার মধ্যে ফলিয়া রঙ্গাইয়া উঠিবে – জীবের শিবত্ব। পূর্ণ প্রকৃতির পূর্ণ দ্যোতনা না খেলাইয়া ভাসাইয়া তুলিলে পূর্ণ শুদ্ধি ও পূর্ণ সিদ্ধিরও সম্ভাবনা নাই। **

– – – – – – – – – –

** শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সৌজন্যে

শ্রীঅরবিন্দের সাধনা **শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়**

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের শ্রীশ্রীমায়ের একটি বাণী হচ্ছে (১৫.৮.১৯৭২)– "Lord, we are upon earth to accomplish Thy work of transfor mation. It is over sole will, sole occupation"– "ভগবান তোমার রূপান্তরের কাজ সুসম্পন্ন করবার জন্যেই আমরা পৃথিবীতে রয়েছি। তাহাই আমাদের একমাত্র সংকল্প, একমাত্র প্রবৃত্তি" – শ্রীঅরবিন্দ যোগসাধনার মূল কথা এইখানে – এই সাধনা নিজেদের ব্যক্তিগত মুক্তি বা নির্বাণের দিশা দেয় না – কিন্তু শিক্ষা দেয়, দীক্ষা দেয়, শ্রী অরবিন্দের ভাষায় – "To be in full union with the Divine is the final aim. When one has some kind of constant union, one can be called a Yogi, but the union has to be made complete. There are Yogis who have only the union on spiritual plne, others who are united in mind and heart; others in the vital also. In our

DO NOT COPY

Yoga our aim is to be united in the physical consciousness and on the supramental plane. (On Yoga II, Tome one, P.483)

এর ভাবার্থ হচ্ছে যে, শ্রীঅরবিন্দ বলছেন – সব যোগেরই উদ্দেশ্য যুক্ত হওয়া সেই পরম ও চরমের সঙ্গে; কিন্তু সেই যোগ যাতে সম্পূর্ণ হয় শুধু কায়েন মনসা বাচা নয়, শুধু জ্ঞান, কর্ম, ভক্তির মাধ্যমে নয়– সব কিছু দিয়ে, সব কিছু নিয়ে একেবারে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া শুধু আধ্যাত্মিক স্তরে (Spiritual plane) নয়, শুধু চিত্ত নিতি নৃত্যে বা মনের গভীরে গহ্বরে মশগুল হয়ে থাকা নয়, শুধু জৈব জীবনেও যেন প্রতিনিয়ত নিত্যরাস হচ্ছে তাও নয়, সে সব ত আছেই– আমাদের যোগ হচ্ছে তার সঙ্গে সাধারণ জৈবিক জীবনেও যেন তিনিই ধ্যান জ্ঞান মনন নিদিধ্যাসন আবার মননের স্তর পেরিয়ে অধিমানসে অতি মানসেও তাঁকে সম্পূর্ণভাবে পাব। এর মানসাঙ্ক ০–০=০, অর্থাৎ শূন্য থেকে শূন্য বাদ দিলে যেমন শূন্যই থাকে তেমনি পূর্ণ থেকে পূর্ণ বাদ দিলে পূর্ণই থেকে থাকা– পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। কিছুই 'নেতি' নয় সবই ইতি বাচক। সেইজন্য সেই পরম দিব্যের তিনরূপ তিনি–

(১) সর্বভূতান্তরাত্মা (Cosmic self and spirit that is behind all things) যাকে আমরা বুঝিনা শুধু অজ্ঞানতার ক্রিয়ায় অচেতনতার বশে। (২) তিনিই আমাদের জীবনের ক্রান্তি লগ্নের পুরুষোত্তম, 'হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি' অন্তর্যামী পুরুষ– Ghostic Being.

(৩) আবার তিনিই সর্বব্যাপী, সর্বত্র, বিশ্বগ, বিশ্বাতীত, সত্য, শিব, সুন্দর– Transcendental Being– তাঁর স্পর্শে আলোকের ঝরণা ধারা ধুইয়ে দেয় আমাদের কালোর সব মালিন্য, নিয়ে আসে আলোর বন্যা আর আমরা দেখি সেই তিনকে– The Transcendental, the Cosmic, the Individual–সেই আনন্দময়কে, প্রেমময় শক্তিময়কে – God the father, God the son, God the Holy ghost কে–

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং,
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

DO NOT COPY

পাতঞ্জল দর্শনে সেই পুরুষকে বলা হয়েছে "ক্লেশকর্মবিশাকাশৈর পবামৃষ্ঠঃ(ঈশ্বর)", সাংখ্য কারিকায় আছে "পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং"। যোগদর্শনে সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ব স্বীকৃত। গীতাতেও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিশ্বতত্ত্বের ব্যাখ্যায় পঞ্চমহাভূত, অহংকার, বুদ্ধি, দশ ইন্দ্রিয় ও মন, পঞ্চ তন্মাত্র ও অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতির উল্লেখ আছে- এ ছাড়াও ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা, স্মৃতি(গীতা ১৩/৬-৭) প্রভৃতির উল্লেখ পাই। সব পেরিয়ে আসেন যিনি উত্তম পুরুষ।

শ্রীঅরবিন্দ যোগেও এগুলি অবান্তর নয়, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি সচেতন করে দিচ্ছেন, তিনি কোন নূতন ধর্মপ্রণালী বা সাধনার ক্রমও ব্যক্ত করেন নি এবং তাঁর দর্শনও বেদ, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতিকে অবলম্বন করে তাঁর নিজের বহুবিস্তৃত উপলব্ধিকে ছড়িয়ে দিয়েছে আমাদের মধ্যে এবং তাছাড়া তাঁর সাধনায় শুধু হিন্দু বৌদ্ধ জৈন কেন ইসলাম খ্রীষ্টধর্ম ব্যাখ্যাত কোন সাধনপ্রণালীকে হীন ত' করেই নি বরং উচ্চে তুলে ধরেছে। তাঁর বিবর্তনবাদ বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদকে আরো এগিয়ে দিয়েছে- শুধু Intuitive Awarness নয়- যে দিব্য আমার মধ্যে সূক্ষ্মভাবে involved তারই evolution তার কাম্য- The animal is a living laboratory in which nature, it is said, worked out man. Man himself may well be a thinking and living laboratory in whom and with whose conscious co-operation. She wants to work out the superman- এই বিবর্তনের চেতনা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে চিন্তা। এর মধ্যে আছে আরোহণ ও অবরোহণ-(ascent ও descent)। অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তির কথা আমরা সবাই জানি- কালী আর ব্রহ্মের উপমা দিয়েছিলেন পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। কালী কাকে বলি- কালং কলাতি যা সা – কাল অর্থাৎ Time space continuum- এর ঊর্দ্ধে যে শক্তি ক্রিয়াশীলা তিনিই কালী- মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা। সেই আদ্যাকেই আমরা 'বৃণুতে'। চণ্ডীতে তাই পড়ি-

দেবী প্রপন্নার্তি হরে প্রসীদ

DO NOT COPY

প্রসীদ মাতর্জগতোহখিলস্য
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বং
তমীশ্বরী দেবী চরাচরস্য
আধারভুতা জগতস্তমেকা
মহীস্বরূপেন যতঃ স্থিতাসি।

যুগে যুগে মহাপুরুষরা আসেন, যখনই 'ধর্ম্মস্য গ্লানির' স্ংঘটন হয়, অবতারকল্প পুরুষরা দেখা দেন, মোড় ঘুরে যায়-তবে কদিনের জন্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-

ওরে ভাই কার নিন্দা কর তুমি। মাথা করো নত
এ আমার, এ তোমার পাপ
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহুযুগ হতে জমি বায়ু কোণে আজিকে ঘনায়
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ
বঞ্চিতের নিত্য চিত্ত ক্ষোভ
জাতি অভিমান-

এ জগৎ অসত্য নয়, লীলাও নয়, নির্বিশেষে ও সবিশেষে ভগবদসত্তারই প্রকাশ। শ্রীঅরবিন্দ এই কথাই বললেন - তাঁর সাধনা এই সত্যকেই বিকাশ করে।

এই প্রসঙ্গে বলা উচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ একটি অবিচ্ছিন্ন ধারাকেই নবভাবে রূপায়িত করে ভারতীয় চেতনার সর্বশ্রেষ্ঠ ফলটিকে জনগনমনে নিমগ্ন করতে চেয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন- শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব হতেই সত্যযুগের সূচনা হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের বাল্য ও কৈশোর জীবনের কথা আগেই বলেছি। ১৮৯৩ সাল জাতির ইতিহাসে এক বিচিত্র ঘটনাবহুল সংকেত। পূব থেকে পশ্চিমে চলেছেন ভারতীয় সংস্কৃতির জ্ঞানের,

DO NOT COPY

আধ্যাত্মিকতার প্রবাহ নিয়ে একজন জগজ্জয়ী সন্ন্যাসী আর ওখান থেকে প্রতীচ্যের জ্ঞান, বিদ্যা, মানবিকতার বারতা নিয়ে আসছেন ভারতবর্ষে আর একজন ২২ বছরের তরুণ- শ্রীঅরবিন্দ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যে শ্রীঅরবিন্দকে বিশেষ ভাবে অভিভূত করেছিলেন তার বহু প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধের সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দিচ্ছি- ধর্ম পত্রিকা ১৯০৮ ১৮শ সংখ্যা-পৌষ ১৯-শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভবিষ্যৎ ভারত (Sri Aurobinda centenary library Edition vol IV p. 439)- "ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি ও তাঁহার সম্বন্ধে যে সমস্ত পুস্তিকা রচিত হইয়াছে, তৎপাঠে জানা যায় যে তিনি দেশে যে নূতনভাব গঠিত হইয়াছে, যে ভাবরাশি সমগ্র ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়া ফেলিতেছে যে ভাবতরঙ্গে মত্ত হইয়া কত যুবক সমস্ত তুচ্ছ করিয়া আত্মাহুতি প্রদান করিতেছে সে ভাবের কথা কিছুই বলেন নাই, সর্বভূতান্তর্যামী ভগবান তাহা দেখেন নাই- একথা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি? যাঁহার পাদস্পর্শে ধরণী সুখমগ্না, যাঁহার আবির্ভাবে বহুযুগ-সঞ্চিত তমোভাব বিদূরিত, যে শক্তির সামান্য মাত্র উন্মেষে দিগদিগন্তব্যাপী প্রতিধ্বনি জাগরিত হইয়াছে; যিনি পূর্ণ, যিনি যুগধর্ম প্রবর্তক, অতীত অবতারগণের সমষ্টি স্বরূপ তিনি ভবিষ্যৎ ভারত দেখেন নাই বা তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই এ কথা আমরা বিশ্বাস করিনা- আমাদের বিশ্বাস যাহা তিনি মুখে বলেন নাই তাহা তিনি কার্যে করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভবিষ্যৎ ভারত প্রতিনিধিকে আপন সম্মুখে বসাইয়া গঠিত করিয়া গিয়াছেন। এই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ। লোকগুরু তাঁহাকে যে ভাবে গঠিত করিয়াছিলেন তাহাই ভবিষ্যৎ ভারতকে গঠিত করিবার উৎকৃষ্ট পন্থা। তাঁহার সম্বন্ধে কোনো নিয়ম বিচার ছিল না। তাঁহাকে তিনি সম্পূর্ণ বীর সাধক ভাবে গঠন করিয়াছিলেন। তিনি জন্ম হইতেই বীর, ইহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহাকে বলিতেন- "তুই যে বীর রে।" তিনি জানিতেন যে, তাঁহার ভিতর যে শক্তি সঞ্চার করিয়া যাইতেছেন কালে সেই শক্তির উদ্ভিন্ন ছটায় দেশ প্রখর সূর্য করজালে আবৃত হইবে। আমাদের যুবকগণকেও এই বীর ভাব সাধন করিতে হইবে। তাহাদিগকে বেপরোয়া হইয়া দেশের কার্য করিতে

হইবে এবং অহরহ এই ভবিষ্যৎবাণী স্মরণ রাখিতে হইবে – "তুই যে বীর রে।"

এই বীরভাবেই সাধনা শ্রীঅরবিন্দের সাধনা – এ হচ্ছে পূর্ণ সাধনা, জগৎকে, দেশকে, দেশের পরাধীনতাকে বাদ দিয়ে নয়–

মানব অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান
বিধাতার বক্ষ আজি বিদারিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলেস্থলে বেড়ায় ফিরিয়া
শুধু একমনে হও পার
এ প্রলয় পারাপার
নূতন বিজয় ধ্বজা তুলে।

শ্রীঅরবিন্দ সেই ধ্বজাই তুলে ধরেছিলেন– পূর্ণ জীবনের, পূর্ণ যোগের, পূর্ণ সাধনার ধ্বজা– তাই তাঁর কম্বুকন্ঠে শুনি– Do not worry about mistakes in work, often you imagine that things are badly done by you when really you have done them very well, but even if there are mistakes it is nothing to be sad about. Let the consciousness grow– only in the Divine consciousness (p.683 on yoga II Tome one)

শ্রীঅরবিন্দের সাধনার মুল কথা আমরা পাই তাঁর লেখার সর্বত্র, তাঁর কর্মে ও তাঁর ভাবগম্ভীর জীবনের পরিমন্ডলে। তিনি তো শুধু দার্শনিক নন, তিনি দ্রষ্টা ঋষি। তিনি মননের দ্বারা উপলব্ধি করেছেন যে সত্য তাকেই প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন জীবনের প্রতি স্তরে যা স্বাদু হয়েছে তাঁর কাছে পদে পদে। Life Divine vol.I তাই আরম্ভই হয়েছে দুটি নেতিবাদকে নস্যাৎ করে– The Meteririalist Deniel, The Refusal of the Ascetic আর তার মূলই হচ্ছে মানব জীবনের আস্পৃহা– The Human Aspiration. এই রূপরস ঐশ্বর্যময়ী পৃথ্বীর ডাক তিনি শুনেছেন– কারণ আসলে সব মাটিই যে সোনা–সবই যে ঈশ্বর– ঈশাবাস্যসর্বমিদং এই পৃথিবী তো তাঁরই পাদভ্যাম পৃথ্বী (মুণ্ডক উপনিষদ ২,১,৪) বা পৃথ্বী পা যস্যম্ (বৃহদারণ্যক্ উপনিষদ ১,১,১)। সেইজন্য এই

DO NOT COPY

পৃথিবীকে বর্জন করবার কথা ওঠেই না। তাকে তপস্যার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, নিষ্ঠার দ্বারা বদলে নিতে হয় নয় শুধু তার ভিতর যে ঘনীভূত রস ও শক্তি অবস্থান করছে, তাকে শুধু স্বীকার করা নয় তাকে দেবত্বের বিভূতিতে পরিণত করে, রূপান্তরিত করে একাত্ম হওয়া। কিন্তু এখনই প্রশ্ন উঠবে- আজ বিজ্ঞানের দিন- বিষয়কে জানতে হবে তাহলে? সবেরই মধ্যে দেবত্বের বিভূতি যদি থাকে? কিন্তু এখানে জ্ঞাতা আর জ্ঞেয়ের প্রভেদ যাবে মিলিয়ে- ভাবে জানি আপনাকেই, আত্মাকেই বিষয়টা উপলক্ষ্য রূপে সেই আপনার সঙ্গেই মিলিত। মানুষ যখন আপনার মধ্যে সেই সত্যকার মনের মানুষকে দেখে Divine-কেই দেখে তখন তার সার্থকতা তার আপন উপলব্ধিতে, বিষয়ের যাথার্থে নয়। সেটা অদ্ভুত হোক, অতথ্য হোক তাতে কিছু আসে যায় না। সে লীলায় সুন্দরও আছে, অসুন্দরও আছে, সুখ আছে, দুঃখও আছে, অনাসক্তি আছে, আসক্তিও আছে- রবীন্দ্রনাথ এই ধরণের কথা লিখেছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী সাহিত্যের পথে বইটি যখন উৎসর্গ করেন। এই কথাগুলিই যদি সাহিত্যিক জগতের বিশ্লেষণ থেকে আধ্যাত্মিক জগতে মানস বিচারে নিয়ে যাই, দেখি যে বিবেকানন্দের কথায়-

"মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কালনৃত্য করে উপভোগ
মাতৃরূপা তার কাছে আসে."

মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই মৃত্যুঞ্জয়ী সাধনার শবমুন্ডী আসনে বসে শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়।

তাই কবি গায়-

হে কুমার, হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান ঝনন্ রনন্
বক্ষের পঞ্জর ভেদি অস্তমিত হউক কম্পিত সুগভীর স্বনন্
হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদাত্ত জয়ভেরি করহ আহ্বান
আমরা দাঁড়াব উঠি আমরা ছুটিয়া বাহিরিব অর্পিব পরাণ
চাবনা পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন হেরিব না দিক

গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার উদ্দাম পথিক
মুহূর্তে কবির পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা উপকন্ঠ ভরি
খিন্নশীর্ণ জীবনের শতলক্ষ ধিক্কারলাঞ্ছনা উৎসর্জন করি .....

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ আর এক জায়গায় বলছেন-

What was Ramkrishna? God manifested in a human being, but behind there is God in his infinite personality. And what was Vivekananda? A radiant glance from the eye of Shiva; but behind him is the divine gaze from which he came and Shiva himself and Brahma and Vishnu and Om all exceeding.

তাই শ্রীঅরবিন্দের সাধনা শুধু Being to Becoming নয়, উন্মুখী ভক্তের মদীয়া রতি বা লীলাপিয়াসীর তদীয়া রতি বা কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা নয়, এ সব ত আছেই, তার সাধনা ও সিদ্ধি ব্যক্তিগত নয়, মানব জাতির জন্য- অবশ্য একথা সত্য যে ব্যক্তিগত সাধনায় পূত না হলে মানব জাতির চৈতন্য ও জীবনধারায় একতা আমূল পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় না। এই যে বিবর্তন ধারা- প্রকৃতির ক্রম প্রগতির প্রবণতা- যিনি আমার গুহায়িত হৃদ্দেশে তিনি পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হতে চাইছেন- সব দিকে-সব স্তরে-দেহে মনে অন্তরে-প্রাণময় সত্তা থেকে সর্বচৈতন্যময় জগতে- আধ্যাত্মিক বিবর্তন একেই বলি। ক্রম প্রগতির ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে মানবজাতির মধ্যে তার সমবেত চেতনার মাধ্যমে একটা প্রয়াস চলেছে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক একটা নূতনতর জীবনে উত্তীর্ণ হতে- বিজ্ঞান, দর্শন, অধ্যাত্ম বিদ্যা সবই মানুষকে-তার Human Aspiration কে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। শ্রীঅরবিন্দ বললেন- এই তো এক একটি দিব্যের মন্দিরে যাবর সোপান- এগিয়ে চল-চরৈবেতি। অথচ জীব এক হিসাবে শিব হলেও দুর্বলতার অজ্ঞানের আধার (Inconscient) কিন্তু আবার অন্য দিক দিয়ে দেখলে সে সর্বশক্তিমান, চিন্ময়, পরম ভাগবত-মানুষের একদিকে কবির ভাষায়- আমার আমি- অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রাকৃত ভাব

DO NOT COPY

-নিম্নতম প্রান্ত, আর একদিকে ঊর্ধতম আস্পৃহা- আমিই সেই সোঽহং-হংস- পরিশুদ্ধ ও পরিবর্ত্তিত প্রকৃতি, ভাগবতী শক্তির কেন্দ্র ওং যন্ত্র।

শ্রীঅরবিন্দ স্থূল জড়বাদী বৈজ্ঞানিক নন্ আবার মায়াবাদী কুহেলিকাতেও আবদ্ধ নন। তাঁর সাধনা তাই সব নিয়ে-চিরকল্যাণের পথে অনুগত হওয়া- অচঞ্চল অপ্রগলভ স্তব্ধতার মধ্যেও।

রবীন্দ্রনাথের কথাতেই শেষ করি এই অধ্যায় -

আমার গুরুর পায়ের তলে
শুধুই কিরে মাণিক জ্বলে?
চরণে তার লুটায়ে কাঁদে লক্ষ মাটির ঢেলারে
আমার গুরুর আসন কাছে
সুবোধ ছেলে কজন আছে
অবোধ জনে কোল দিয়েছেন
তাই তো আমি তার চেলারে।

"মানুষ যখন আত্মবিশ্বাস হারায় তখন তার মত দুর্বল অসহায় জীব আর নেই। নিজেকে অক্ষম মনে করার মত পরাধীনতা আত্মবঞ্চনা আর নেই। এ বন্ধন অন্তরের যা মানুষকে পঙ্গু করে দেয়। কাজেই সর্বাগ্রে এ বন্ধন থেকে মুক্তির প্রয়োজন।"

-----নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

DO NOT COPY

পরম বৈষ্ণব শ্রীজীব গোস্বামী **শ্রী অমরেন্দ্র কুমার ঘোষ**

বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের বিখ্যাত বৈষ্ণব বংশে জন্মগ্রহণ করেন শ্রীজীব। পিতা বল্লভদেব ছিলেন চৈতন্যের পার্ষদ যুগল রূপসনাতনের অনুজ।

তিনি ছিলেন শ্রীরামের পূজারী। রঘুনাথ হচ্ছেন তাঁর ইষ্টদেবতা।

রূপ সনাতনের ইচ্ছে ছিল, তিন ভাইয়ে মিলে বৃন্দাবন-ধামে এসে বৈষ্ণবধর্ম ঠিক ঠিক অনুশীলন এবং প্রচার করবেন। কিন্তু বল্লভদেব রাজী হলেন না। তিনি সানুনয়ে অগ্রজদের কাছে জানান,-

‘রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছো মাথা,
কাড়িতে না পায়োঁ মাথা পাও বড় ব্যথা।।
কৃপা করি মোরে আজ্ঞা দেহ দুইজন।
জন্মে জন্মে সেয়োঁ রঘুনাথের চরণ।।’

তাঁর অন্তরে রঘুনাথের প্রতি ‘প্রগাঢ়’ ভক্তির পরিচয় পেয়ে শ্রীচৈতন্য নাম দেন অনুপম।

এই অনুপম গৌড়ের নবাব হুশেন সাহের দরবারে কাজ করতেন। টাঁকশালের হিসাব রাখতেন।

সেবার শ্রীরূপ সংসার ত্যাগ করে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ স্মরণ করেন, অনুপম তাঁর সঙ্গী হয়ে শ্রীবৃন্দাবন ধামে যান। পরে ওখান থেকে ফেরার পথে কয়েক দিনের অসুখে তাঁর প্রাণ বিয়োগ ঘটে।

জীব তখন পাঁচ বছরের বালক।

বিধবা মায়ের কাছে বসে পিতৃব্যদ্বয় রূপ সনাতনের কীর্তিগাথা শুনতেন। তাঁর মনেও শিশুকাল থেকে বৈষ্ণবীয় ভাব প্রকাশ পায়। বৈষ্ণব বেশে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি নিয়ে খেলা করতেন। ক্রমে বড় হলেন জীব। শিক্ষায়তনে নিয়মিত শিক্ষালাভ করে বিভিন্ন শাস্ত্রে পণ্ডিত হন। তারপর নবদ্বীপে এসে শাস্ত্রাদি প্রসঙ্গে আরও উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে অগ্রনী হলেন। তিনি সংসারী হন নি। আজীবন কুমার থেকে নিষ্ঠাসহকারে প্রেম-ভক্তির সাধনা করবার জন্যে মন স্থির করেন।

DO NOT COPY

সনাতনের নির্দেশমত শ্রীরূপের কাছে শ্রীজীব বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরে নবদ্বীপে এসে নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে মিলিত হন। সেখানে কিছুকাল থাকেন। নিত্যানন্দের আদেশে তিনি বৃন্দাবন ধামে যাত্রা করেন।

বৃন্দাবনে যাবার আগে নিত্যানন্দ বললেন শ্রীজীবকে, তুমি কাশীধামে যাও। সেখানে পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম বেদান্ত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তুমি তাঁর কাছ থেকে বেদান্ত শাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করো। শ্রীজীব তাই করলেন।

শ্রীচৈতন্য দেহ রেখেছেন। অন্যান্য বৈষ্ণবগণ নীলাচলে, গৌড়ে আর শ্রীবৃন্দাবনে তাঁর পবিত্র প্রেম ও ভক্তি ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারে ব্রতী হন।

শ্রীজীব নানারকম কৃচ্ছ্রসাধনা করে বৈষ্ণবধর্মে অগাধ প্রেম ও ভক্তির অধিকারী হলেন। গুরুদেব শ্রীরূপের নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষার পর শ্রীজীব একজন পরম ভক্ত হয়ে ওঠেন।

শ্রীরূপ বৃন্দাবনে থাকাকালে রাধা-দামোদরের বিগ্রহ পুজো করতেন। এবার শ্রীজীব গুরুদেবের নির্দেশমত ঐ বিগ্রহ নিয়মিত সেবা করতে থাকেন। রাধা-গোবিন্দের জন্যে নতুন মন্দির তৈরী হলো। এই মন্দিরে বৈষ্ণব গ্রন্থের একটি সংগ্রহশালা খোলা হলো। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে দুষ্প্রাপ্য বৈষ্ণব গ্রন্থ এনে এখানে রাখা হলো। নিয়মিতভাবে সেগুলি পাঠ ও আলোচনা হতে লাগলো।

সনাতন, রূপ আর প্রবোধানন্দ ইহলীলা সংবরণ করলে শ্রীজীব বৈষ্ণব মণ্ডলীর নেতা নির্বাচিত হন এবং পরম কৃতিত্বের সঙ্গে নিজের ধর্ম পালন করেন।

এই সময় তাঁর নাম সারা ভারতে প্রচারিত হয়। দিগ্বীজয়ী পণ্ডিতগণ তাঁর কাছে এসে বিভিন্ন শাস্ত্র চর্চা করতে থাকেন। বাংলাদেশের বহু নতুন বৈষ্ণব লেখক বৃন্দাবনধামে এসে শ্রীজীবের কৃপালাভ করে ধন্য হন।

সম্রাট আকবরও এলেন বৃন্দাবন ধামে বৈষ্ণবদের আখড়া দর্শন করতে। তিনি কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্ণভক্তির মাহাত্ম্য হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন এবং বুঝতে পারেন বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে প্রকৃত ঐশ্বরীক ঐশ্বর্য বিদ্যমান।

তখন নিয়ম ছিল, বৃন্দাবনে কেউ নতুন মন্দির স্থাপন করতে পারবে না। তা করতে হলে সম্রাটের অনুমতি দরকার।

DO NOT COPY

সম্রাট আকবর সে নিয়ম নাকচ করে দেন। বৈষ্ণবদের অনুরোধ মত তিনি শ্রীবৃন্দাবনধাম সুরক্ষিত রাখেন। কোন তস্কর বা বিধর্মীর উৎপাতে যাতে বৃন্দাবনের পবিত্র রজ এবং রাধা গোবিন্দর মন্দির কলঙ্কিত না হয় তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন মোঘল সম্রাট স্বয়ং আকবর।

প্রায় ষাট বছর ধরে শ্রীজীব শাস্ত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। পরে তিনি পঁচিশটির বেশি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে 'ভাগবত সন্দর্ভ' হচ্ছে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

বৃন্দাবনে বৈষ্ণব ধর্মের প্লাবন বয়ে চলেছে। এই প্লাবনের অগ্রদূত-রূপে রয়েছেন শ্রীজীব। কৃষ্ণ প্রেম আর ভক্তির মাহাত্ম্য সারা ভারত ব্যাপী ব্যক্ত হয়ে পড়েছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীরা এর রসাস্বাদন মানসে অধীর হয়ে উঠলেন।

এই সময় তিন জন বৈষ্ণব এলেন শ্রীজীবের কাছে। এঁরা হলেন শ্রীনিবাস, নরোত্তম আর শ্যামানন্দ। শ্রীনিবাস আর নরোত্তম এলেন বাংলা থেকে আর শ্যামানন্দ আসেন ওড়িশা প্রদেশ থেকে।

এই তিন জন পবিত্র বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিয়ে শ্রীজীবের অনুগামী হন।

শ্রীজীব ভাবলেন, বৃন্দাবনের এই প্রেমধর্ম বাংলাদেশে প্রচার করা প্রয়োজন। তাই তিনি শ্রীনিবাস, নরোত্তম আর শ্যামানন্দ এই তিন তরুণ ভক্তকে এক বাক্স বৈষ্ণবগ্রন্থ সঙ্গে দিয়ে বাংলাদেশে পাঠান। তাঁরা বহু দুর্গম পথ পার হয়ে বাংলাদেশে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে এলেন।

মল্লরাজ বীর হাম্বির রাজা ছিলেন বিষ্ণুপুরের। বৈষ্ণবরা যখন তাঁর রাজ্যের মধ্যে দিয়ে যাত্রা করছিলেন সেই সময় বৈষ্ণব গ্রন্থপূর্ণ কাঠের বাক্সটি ডাকাতদল লুণ্ঠন করে। তারা মনে করলো, ওটার মধ্যে বোধ হয় প্রচুর স্বর্ণালঙ্কার আছে। ওটাকে হস্তগত করলে প্রভূত ধনৈশ্বর্যের অধিকারী হওয়া যাবে।

পবিত্র বৈষ্ণব গ্রন্থগুলি লুণ্ঠিত হলো। এই সংবাদ শুনে সারা ভারতের বৈষ্ণব-গণের মনে দুঃখ ও ক্ষোভের অন্ত রইলো না। শ্রীজীবের মনে নিদারুণ আঘাত লাগলো। তিনি মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হন।

এদিকে মল্লরাজ একদিন ভাগবত ব্যাখ্যা শুনছিলেন। শ্রীনিবাস তাঁর কাছে ঐ ব্যাখ্যা করছিলেন। তিনি তাই শুনে বড় মুগ্ধ হয়ে যান।

পরে শ্রীনিবাসকে তিনি বৈষ্ণব গ্রন্থ লুন্ঠনের ইতিহাস খুলে বললেন। তাঁর আদেশ মত বৈষ্ণবরা পুনরায় সেই অপহৃত মহামূল্যবান গ্রন্থগুলি ফিরে পান।

অতঃপর ঐ তিনজন বৈষ্ণব সাধকের চেষ্টায় সারা বাংলা ও ওড়িশা প্রদেশে কৃষ্ণপ্রেম আর ভক্তির বন্যা বয়ে যায়।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের মনোমত কাজ সম্পূর্ণ করে অর্থাৎ পবিত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ও ভক্তির নবজাগরণ ও প্রচার কার্য সমাধা করে শ্রীজীব ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে নিত্যলীলায় প্রবেশ করলেন।

ক্রান্তিবৃত্তে **সুনন্দন ঘোষ**

ক্রান্তিবৃত্তে সূর্য ঘোরে,
সংক্রান্তি পুরুষ ভ্রমণ করেন রাশিচক্রে,
পৃথিবীর রূপ বদলায়, তাপ বদলায়,
মানুষের চেতনার রঙ বদলায় .....।

শরীর থেকে শরীরে সঞ্চরণ করে জীবাত্মা,
খুঁজে নেয় পঞ্চভূতে নতুন শরীর।
পুনরপি জননং পুনরপি মরণং
পুনরপি জননী জঠরে শয়নং .....
কত ব্যথা, কত দীর্ঘশ্বাস জন্মবৃত্তে!
তবুও তো ভালো লাগে না যাবার কথা ভাবতে!
কি যে মায়া...!!!

সন্তান বড় হয়েছে।
মাঝে মাঝে মনে হয় কত দূরে চলে গেছে
আমাদের চেনা নাগালের বাইরে;

DO NOT COPY

ডেঙ্গুতে দুর্বল সে যখন বিছানায় শুয়ে
আমার হাতটা আঁকড়ে ধরে থাকে,
বুঝতে পারি আমি কিছুই বুঝিনি।

আর একজন, যার সঙ্গে ঝগড়া করেই কাটলো
একত্রিশটা বছর,
ম্যালেরিয়ায় যখন সে কাঁপছে একশ ছয় জ্বরে,
চোখের জল লুকিয়ে নীরব প্রতিজ্ঞা ---
আর ঝগড়া করব না।

তারপরেও
ফিরে আসে প্রতিজ্ঞা ভাঙার পৌনপুনিকতা।
কি করে কাটবে দ্বন্দ্বহীন নির্বাক সময়?
অতএব বাক্যের রংমশালে আবার
রঙীন হয়ে ওঠে এ জীবন!

যেতে তো হবেই কাল, পরশু বা পরের দিন .....
সংক্রান্তি পুরুষ দরজায় পা রাখার আগেই
এ'বারের মতো পান করে নিই
সময়ের প্রতিটা বিন্দু।

DO NOT COPY